লাল দেদ

লাল্লেশ্বরীর বাক সংগ্রহ

লাল দেদ

লাল্লেশ্বরীর বাক সংগ্রহ

অনুবাদ

জয়ন্ত ঘোষাল

লাল দেদ: লাল্লেশ্বরীর বাক সংগ্রহ
জয়ন্ত ঘোষাল-কৃত লাল দেদের বাকসমূহের বাংলা তরজমা

একুশে ভাদ্র শুক্রবার ১৪২৫ তারিখে প্রথম প্রকাশিত হল

যোগাযোগ ৭২৭৮৪৬৩৬৩৪

মলাট এঁকেছেন প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রণ সম্পাদনা করেছেন সেলিম মল্লিক

অস্ট্রিকের পক্ষে মিতা বসাক
শিমুলিয়া পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১ ৬৪৯ থেকে প্রকাশ করেছেন
এবং ছেপেছেন শরৎ ইম্প্রেশনস প্রা. লি. কলকাতা ৭০০ ০৭৩

একশো পঁচিশ টাকা

ইন্দ্রাণী ও হার্দিককে

ভূমিকা

ঘটনার গায়ে কিংবদন্তির আলো-ছায়া লাগলে যেমন রহস্য তৈরি হয়, সেরকম তাঁর জন্মের কাহিনি। কাশ্মীর পেরিয়ে বৃহত্তর ভারতবর্ষে প্রবাহিত সে-কাহিনির শতধারা। তিনি লাল দেদ। লোকমুখে তাঁর আরও নাম ঘুরে ঘুরে ফেরে জনপদ থেকে জনপদে। কেউ বলেন লাল্লেশ্বরী। মুসলমানেরা ডাকেন লাল্লা আরিফা। আরিফা সেই নারী, যিনি আত্মজ্ঞানে দীপ্ত। শ্বশুরবাড়িতে নাম ছিল পদ্মাবতী। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হওয়ার কালে সে-নামটি ত্যাগ করেছেন। নিজেকে লাল্লা বলতেই পছন্দ করতেন। লাল বা লাল্লা, কাশ্মীরি ভাষায় যার অর্থ বড়ো হয়ে যাওয়া পেট। নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কৌতুক। হয়তো কৌতুকের ভেতর দিয়েই গণজনের মর্মে পৌঁছোতে চেয়েছেন তিনি। সংসারের মতো ছেড়েছিলেন সকল আবরণ। দিগম্বরী শরীর আর জ্বলে ওটা মনীষার শিখাকেই সম্বল বুঝেছিলেন।

মতের অনৈক্য আছে, তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, ১৩০০ থেকে ১৩২০ খ্রিস্ট অব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে লাল্লার জন্ম। ১৩৩৪-১৩৩৫ সনকেও কেউ কেউ মান্য দেন। আর তিরোভাব মোটামুটি ১৩৭০-এর আশেপাশে হবে বলে অনুমান। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু কোনোটারই বিন্দুমাত্র সাল-তারিখের উল্লেখ মেলে না কাশ্মীরি ইতিবৃত্তে, এমনকী সন্তদের নিয়ে রচিত সন্দর্ভে। অনুপায়ে নির্ভর করতে হয় কেবল ক-টি লোকশ্রুতির

ওপর। লোকশ্রুতিকে অকাট্য ঐতিহাসিক না বলা গেলেও, তাতে নিহিত ইতিহাসের বীজকে উপেক্ষা করা কোনো কাজের কথা নয়। জয়লাল কাউল এমন কোনো কোনো লোকশ্রুতির নির্ভরে আর পণ্ডিত আনন্দ কাউলকে উদ্ধৃত করে জানাচ্ছেন: মির সৈয়দ আলি হামাদিন, লাল দেদ এবং নুন্দ ঋষি বা নুরউদ্দিন ঋষি একসঙ্গে অধ্যাত্ম-আলোচনা করতেন। যখন কিনা এ-কথা জানা যায়, শাহ হামাদিন প্রথমবার কাশ্মীরে আসেন ১৩৭২-'৭৩ সাল নাগাদ। আর নুন্দ ঋষির জন্মসাল ধরা হয় ১৩৭৭ সাল। তাহলে তো লাল্লার মৃত্যুর সময় সম্পর্কে প্রায় দুই দশকের ব্যবধান নিয়ে তর্ক অমূলক নয়। জন্মস্থানও মতান্তরের বাইরে না— কেউ বলেন পাম্পোরের কাছে সেম্পোর, কারো-বা অনুমান পানদ্রেনথান।

লাল্লার কর্মকাণ্ডের সময়ে কাশ্মীরের ক্ষমতায় আসীন সুলতান আলা-উদ-দিন (১৩৪৩—১৩৫৪)। তারপর সুলতানি মসনদে বসেন সাহিব-উদ-দিন। ১৩৭৩ সাল পর্যন্ত সুলতান ছিলেন তিনি। এঁর আমলের শেষদিকে নাকি লাল্লার মৃত্যু। তা নাও যদি সত্য হয়, যদি জয়লাল কাউলের মতটিকেই (১৩৮৮ থেকে ১৩৯১-এর মধ্যে কোনো-এক সময়) অধিক গ্রহণীয় বোধ করা যায়, তা সত্ত্বেও লাল্লার আবির্ভাব, বিকাশ এবং তিরোভাবের সাময়িক গুরুত্বের তেমন কিছু হেরফের ঘটবে না। কারণ, ওই সময়ের বিশিষ্টতা কম-বেশি একইরকম ছিল, যা কিনা লাল্লার মত ও পথ গড়েছে। তাই দু-এক দশকের তর্ক তথ্যের যাথার্থ্যের প্রশ্নে বই অন্য কিছুর প্রয়োজনে নয়। ওই সময়, কাশ্মীরে সুফি সিলসিলার স্ফূরণ হচ্ছে। নানা ধারার ইসলামি মরমিয়া রহস্যপন্থীরা শরিয়তি নিয়মের বাঁধন খুলে আশমানি কিতাবে উক্ত নুরের সন্ধান করছেন। তখন কাশ্মীরের সুফি পরস্পরার একটি ধারার নাম ছিল ঋষি, যা সংস্কৃত ঋষি শব্দের মান্যতা নিয়েই গড়ন পেয়েছে। এই ধারার সাধক নুরউদ্দিন ঋষি লাল্লাকে গুরুজ্ঞানে

স্তুতি করেছেন। তার মানে সমকালেই সুফিরা লাল্লাকে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও লাল্লার বাকের বিচার করলে যত উপাদান মেলে, তার নিরিখে নিশ্চিত হয়ে বলা চলে, তিনি ছিলেন ত্রিকপন্থী শৈব-সাধিকা। কাশ্মীরের শৈবধারা বেশ পুরোনো। খ্রিস্টীয় নবম শতকে বাসুগুপ্তের *শিবসূত্র* ও দশম শতকে অভিনবগুপ্ত রচিত উপলাদেবের *ঈশ্বরা-প্রত্যাভিজ্ঞান-কারিকাস*-এর বিশদ ব্যাখ্যা ও *তন্ত্রালোক*-এর দ্বারা যার গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। যার প্রভাব দাক্ষিণাত্য থেকে বৈষ্ণবসাধক রামানুজকেও কাশ্মীরে আসতে বাধ্য করেছিল। ত্রিকপন্থী শৈবরা অদ্বৈতবাদী। এঁদের মতে মুক্তি ও শৃঙ্খলা ক্রমাগত এবং ক্রমান্বিত। এবং এঁরা প্রতি-অভি-জ্ঞান। লাল্লার বাকে এর চিহ্ন ফুটে আছে। যদিও লাল্লা কোনোভাবেই কবিতার পদ রচনা করতে চাননি। বাক বা কথন, যাই বলি-না-কেন, সেসব সুরে বাঁধা বচন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গেয়েছে মানুষ। মানুষের অন্তরের পথে পথে বাহিত হয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে, হয়েছে সর্বত্রগামী। মা-ঠাকুমারা ঘরে ঘরে গুনগুন করে যে-কথা বলেছে, পরে তা কাশ্মীরের মার্গসংগীতের ধারা সুফিয়ানা কালামের অংশ হয়ে সুফিদের মজলিশ মাতিয়েছে। যদিও তাঁকে শৈব ত্রিকপন্থার পথিকা বলা হয়, তবু এ কখনো বলা চলে না যে, তিনি ধর্মের প্রচারক বা সংঘের নির্মাতা। তাই তিনি শেষপর্যন্ত দলহীন বৃত্তভাঙা এক বিদ্রোহিণী। না, কোনো বিদ্রোহও তিনি করেননি কোনো কালে। তিনি শুধু আলগা হাতে ভেঙে দিয়েছিলেন পুরোনো নিয়ম আর বহুকালের প্রথা দিয়ে তৈরি বেড়া। তাঁর বাচনভঙ্গি, যাকে বাক বলেছেন পণ্ডিতেরা, সেসবে নানান সংকেত, যা সাধনার গুহ্য প্রতীক— কখনো শৈব, কখনো বৈষ্ণব, কখনো বৌদ্ধ অনুষঙ্গে একাকার। তাঁর বাকে পাই 'জিনা' শব্দ, যা সাধারণভাবে বুদ্ধকে বোঝায়। তাঁর বাক-সকল এমনই বর্গহীন যে, পরে তাদের অঙ্গীকার করেছেন আরও বহু মতের মহাজন।

পরবর্তী কালের অনেক মহাজনের লিখনে কথনে তার প্রত্যাবর্তন যেন আত্মার অবিনশ্বরতার মতো। মহৎ প্রত্যয় তো এমন করেই চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকে। যেমন নুরউদ্দিন ঋষির তিরোভাবের প্রায় দু-শো বছর পর ষোলো শতকে *নুরনামা* বা *ঋষিনামা* নামের যে ফারসি পুথি লেখা হয়, তাতে বেশ কিছু পদ আছে, যারা লাল্লার বাকের প্রায় অবিকল্প। একই কথা তোলা যায় রূপা ভবানীর *রহস্যোপদেশ*-এর কয়েকটি কথনের প্রসঙ্গে। আবার এই নিয়ে তর্ক আছে, আদতে তা কার লেখা? তর্ক তো থাকবেই। এত এত বছর পর পূর্বাপার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল।

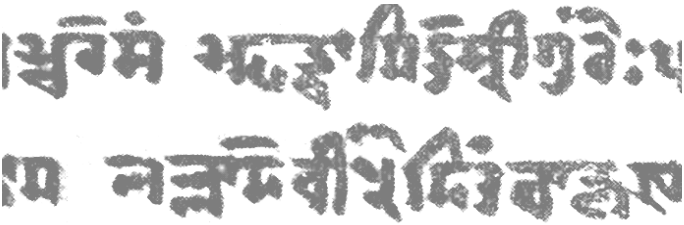
আমরা জানি, ত্রিকপন্থী শৈবরা সাধনে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। দ্বৈতভাবে ভাবিত মানুষ শিবের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বের অভিন্নতা ভুলে গেলে কঠোর যোগের মাধ্যমে আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেই অদ্বৈততাকে জানতে পারেন। ইসলামি মরমিয়া সাধকের সঙ্গে এ-জিনিসের নৈকট্য আছে, তাই বোধ হয় মুসলমানদের কাছে তিনি তাঁর কালেই আদরে গৃহীত হয়েছেন। তাঁর সুফিসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, ত্রিকপন্থী শৈবদের সঙ্গে সুফিদের যোগাভ্যাসে শ্বাসের ক্রিয়াতে মিল আছে। হয়তো তাই কাশ্মীর ও কাশ্মীরের চারপাশের বিস্তৃত এলাকার মরমিয়াবাদী মুসলমানেরা তাঁকে আপনার জন হিসেবে হৃদ-মাঝারে ধরে রেখেছিলেন। আরেকটা মিলের কথা বলা অসংগত হবে না যে, লাল্লা পৌত্তলিকতার দেউল অস্বীকার করে পুতুলখেলাকে নস্যাৎ করে গেছেন। এমনটা আরও বৃহদ্ভাবে লক্ষ করা যায় মধ্যযুগের আর-এক সন্ত কবীরের দোঁহায়। ধর্মের আচার আর মূর্তির সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যা আকাশের মতো বিশাল এক কুসুম ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। কর্মযোগের মাধ্যমে পরমের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় প্রেমের জোয়ার এনে দিয়েছিল যে-ভক্তিবাদ, মধ্যযুগের সেই ভাব-আন্দোলনগুলোর মূল সুরের পূর্বসূরী লাল্লার বাক।

এহেন লাল্লার উল্লেখ দেখি না জোনারাজার ইতিবৃত্তে। যদিও তাঁর গ্রন্থে সেই সময়ের অনেকানেক গৌণ জনের কথা মেলে। এমনটা আরও অনেক মান্য গ্রন্থেও ঘটেছে। তবে তাতে যে বিরাট কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে, তা নয়। উচ্চবর্ণের হিন্দু কিংবা শরিয়তপন্থী মুসলমান তাঁকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেও, নিম্নবর্গের মানুষ তাঁর কথা বাঁচিয়ে রেখেছেন নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। তথাকথিত ইতর শব্দ আর লৌকিক বয়ান তাঁর বাকের প্রাণসম্পদ। তবে সে-ভাষার যে কী রূপ, তা আজ নমুনা হিসেবে পেশ করা অসম্ভব, কারণ, সেই অতি পুরাতন কাশ্মীরি ভাষা আর ব্যবহৃত হয় না। লাল্লার মুখে মুখে বলা বাক মুখে মুখে ঘুরে ঘুরে বেঁচে বেঁচে থেকেছে। তাই বদলেছে জীবনের ধর্মে। আর তাঁকে নিয়ে পল্লবিত হয়েছে বিচিত্র সব কাহিনি। তা তো হবেই। লোকশ্রুতির স্বভাবই এমন। প্রতিষ্ঠান যখন সুযোগ্য কাউতে মারতে চায়, গণজন তখন তাঁকে রূপে রঙে বিচিত্র করে বাঁচিয়ে রাখে। একটা কাহিনি আছে: একদিন গুরু সিধ শ্রীকান্ত মন্দিরে পূজা করছেন, সেখানে হঠাৎ লাল্লা নগ্নশরীর নিয়ে হাজির। গুরু বললেন, "কী চাস, কী করতে এসেছিস?" লাল্লা বললেন, "প্রস্রাব পেয়েছে, যদিও আমি নগ্ন, তবু এটি একটি ব্যক্তিগত গোপন কর্ম, তাই এর জন্য মন্দিরের একটা ঘেরা জায়গা দেখাও।" গুরু রেগে গিয়ে বললেন, "এ হল দেবতার পূজার স্থান, আর তুই কিনা এখানে এইসব করতে ঢুকেছিস।" তারপর অগত্যা বিগ্রহ নেই এমন একটি ঘর দেখিয়ে দেন গুরু। লাল্লা সেই ঘরে ঢুকে সেখানকার মাটি খুঁড়ে একটা পাথরের বিগ্রহ পেয়ে গুরুকে দেখান। গুরু আবার অন্য একটা ঘর দেখান। লাল্লা সেই ঘরের মাটি খুঁড়েও একটি বিগ্রহ পেয়ে যান। আবার এমনও গল্প আছে: নগ্ন লাল্লা রাস্তায় যোগ্য পুরুষ আসছেন দেখে চকিতে রুটির দোকানের জ্বলন্ত উনুনে ঝাঁপ দিয়ে লুকিয়ে পড়েন। আর সেই পুরুষ উনুনের মুখের কাছে এসে ডাক দিলে

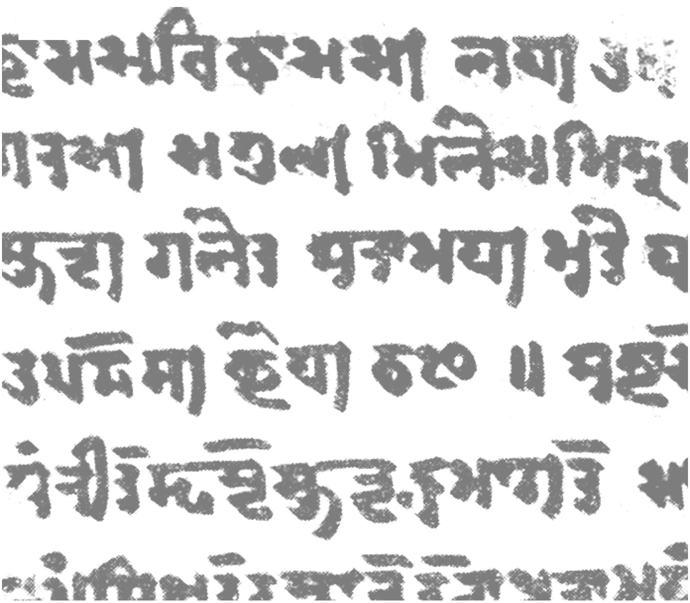
লাল্লা বেরিয়ে আসেন সবুজ পোশাকে আবৃত হয়ে। একটু হেরফের হয়ে গল্পটির অন্য চেহারাও মেলে। গ্রন্থে লাল্লার নাম প্রথম উল্লেখিত হয়েছে সুফি-সন্তবৃত্তান্ত বাবা দাউদ মিশকাঠির *আসরার-উল-আবরার*-এ। তা হবে ১৬৫৪ নাগাদ। ভিন্ন মতে মোল্লা আলি রায়নার সন্তবৃত্তান্ত *তাদকিরাত-উল-আরিফিন* (১৫৮৭)-এ। আর ইতিবৃত্তে লাল্লার নাম প্রথম পাওয়া যায় খাওয়াজা মুহম্মদ আজম কাউল দেদমারির ১৭৪৬ সালে ফারসিতে লেখা গ্রন্থ *ওয়াকত-ই-কাশ্মীর*-এ। মুহম্মদ আসলাম আবু আল-কাশেম 'যুবরাজ সিহাব-উদ-দিন ও যোগিনী' শীর্ষক লোকশ্রুতিতে লাল্লার উল্লেখ করেছেন। পির গুলাম হাসানের *তারিক-ই-হাসান*-এ লাল্লাকে লাল্লা আরিফা নামে উল্লেখ করে অষ্টম শতকের মধ্যপ্রাচ্যের সাধিকা রাবেয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তবু মানুষের হৃদয়কুলুঙ্গির তুলনায় এসব নিতান্ত তুচ্ছ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কৌম রাজনীতিকে ফুৎকারে উড়িয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেবল লোকের মুখে মুখে বেঁচে আছেন লাল্লা। বেঁচে আছেন গোটা কাশ্মীরি সমাজের আত্মজন হয়ে। সাধে কী আর স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ১৯২০ সালে প্রকাশিত তাঁর মনোগ্রাফের ভূমিকা অংশে লিখেছেন, "হিন্দু কী মুসলমান, এমন একজনও কাশ্মীরি নেই, যার জিভের ডগায় লাল দেদের একটুকরো স্মৃতি না-পাওয়া যাবে।" লাল্লার বাক-সমূহের অপূর্ব কাব্যসুষমা শৈবতন্ত্রের গুহ্যতা পেরিয়ে নানা রূপকল্পে, মরমি ভাবে, রহস্যে, জাদুতে দীপ্ত। সেই দীপ্যমান আয়নায় দেখা যায় সমগ্র কাশ্মীরি আত্মার স্ফূরণ। বাকগুলিতে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে নানা দিক থেকে নানান দ্যোতনার বিচ্ছুরণ। যেন স্ফটিক। আলোয় আলোময় তার সমস্ত দিক।

শিবরাত্রি ১৪২৪

জয়ন্ত ঘোষাল



লাল্লেশ্বরীর বাক



১

হে যোগী, অগাধ জলস্রোতে মিশে যাওয়া জলকণিকার মতো
এ বিশ্ব মিলায় না-এ।
যা-কিছু অকাজ ক্ষয়ে গেলে পর রয় যে পূর্ণতা—
ওহে পুরোহিত, এইটুকু শুধু বোঝো।

২

শব্দ কী ভাবনা আর সাধারণ কী পরম সব অর্থহীন,
এমনকী নীরবতা কপাট খোলে না কোনো।
আমরা শিব আর শক্তিকেও পার হই
এমন পেরিয়ে যাওয়া সব পেরোনোর নামান্তর।

৩

রাত্রি দিন এক করে পথে ও বেপথে ঘুরে ঘুরে
পিরিতিপাগল লাল্লা
নিজের ঘরেতে ফিরে দেখেছে গুরুকে—
কী ভাগ্য আমার আহা, আপ্রাণ ধরেছি তাঁকে জাপটে!

৪

আমি শ্বাস আটকে রেখেছিলাম ঠোঁটের ফাঁদে,
আসলে কে আমি— তাকে দেখাল অন্তরে জ্বলা দীপ।
পেরোলাম আঁধার সে-দীপ হাতে নিয়ে,
ঝিকোল আলোর বীজে আমার পেরিয়ে যাওয়া পথের চৌদিক।

৫

যে স্বয়ংকে ভাবতে পারে অপর, অপরকে ভাবে স্বয়ং যে,
যে দিনকে রাত্তির দেখে আর রাতকে দিন,
জানে না যে মন বৈপরীত্য
সে কেবল দেখেছে গুরুকে— যিনি প্রথম দেবতা।

৬

আত্মদীপে প্রোজ্জ্বল যে
ছাড়িয়ে নিয়েছে সে তো নিজেকে তুচ্ছতা থেকে,
বোকারা লাগায় খালি গিঁট
এই পৃথিবীর জট-পাকানো দড়িতে।

৭

সত্যিই আমি কে আর তুমি-বা কে, হে ঈশ্বর, কখনো পারিনি জানতে।
প্রেমকে আমি গলিত শবের কাছে ছেড়ে এসে আর খুঁজতে যাইনি।
তুমিই যে আমি, আমি তুমি,
কে যে আমি, তুমি-বা কে— এসমস্ত ভাবনা ভাবা নিছক সন্দেহ।

৮

কেশব পঙ্কজ না কি জিনা
যে-নামে নিজেকে চেনাক সে,
সে হোক সাধন এই অভাগীর—
সে সেই, যে সেই, কী-বা সেই, ওরে সেই, ওহে সেই।

৯

সূর্য মুছে গেলে চাঁদ ওঠে
চাঁদ ডুবে গেলে আত্মা জাগে,
আর আত্মা গলে যায় যখন— কী থাকে?
আকাশ তরঙ্গ ধরা সকল ঝাপান দেয় শূন্যে।

১০

ওঠো নারী, যাও, গিয়ে ঈশ্বরে অর্পণ করো মদ মাংস রুটি।
অমরাবতীর গুপ্ত দরজা যদি খুঁজে পাও তুমি
পৌঁছোবে, পৌঁছোবে ঠিক মনীষার কাছে,
নিয়ম যা-কিছু ওরে ভেঙে দিতে হবে।

১১

অক্ষর সকল মুছে গেলে স্তব জাগে,
মনন সে জেগে ওঠে স্তব গলে গেলে,
মননের ক্ষয় হলে তাহলে কী থাকে?
শূন্যতার আলিঙ্গন পরম শূন্যকে।

১২

এই রাজপাটে খুশি নও তুমি—
এমনকী পার না যে বিলিয়ে দিতেও তাকে,
যদি লোভ ছাড়তে পার, তাহলে সংকট থেকে বাঁচবে—
বেঁচে থাকতে মরো হে জীবন, তবে মৃত্যুঞ্জয় হবে।

১৩

তোমার ছ-খানা আর আমারও ছ-খানা।
এখন বলো হে নীলকণ্ঠ, এতে তফাত কী— নাকি কিছু নেই?
তোমার যেগুলো— জানি, কুকুরের শিকলে বেঁধেছ,
জান কি, আমার ক-টি আমায় দড়িতে ঝুলিয়েছে।

১৪

শিব হল ঘোড়া আর বিষ্ণু তাঁর জিন,
রেকাবে পা দিয়ে ব্রহ্মা সোল্লাসে ডাকছেন,
অঙ্গের বিন্যাস আর শ্বাসের ক্রিয়ায় পটু যোগী
কেবল জানেন কোন দেবতা ঘোড়ায় চড়বে ও চালাবে।

১৫

অনাহত নাদের টংকার তিনি,
নভ তাঁর দেহ, শূন্যতা যে তাঁর ঘর,
নাম-রূপ ছাড়া তিনি নিজেকে জপেন নিজে।
তিনি সে দেবতা, যিনি ঘোড়াতে চাপেন আর ঘোড়াকে চালান।

১৬

শীতের থাবায় দুই পা দিয়ে বরফ হল জল
আর গুঁড়ো গুঁড়ো মেঘ হয়েছে তুষার— এই তিনাবস্থা।
জ্ঞানের আলোয় তবু সব গলে এক,
এই ধরা, শিবকে না পাওয়ায় সবসুদ্ধ সেই জলে ডুবে গেল।

১৭

মন্দির পাথর এক, ভগবান পাথরপ্রতিম সেও—
মাথা থেকে পা অবধি পুরোটা পাথর।
তোমার পূজার মানে কী, ওহে পূজারি?
সব কাজ জড়ো করো, মননের সঙ্গে জোড়ো জীবনের শ্বাসে।

১৮

ওরা গালি দিক, তাতে কিছু যায়-আসে না আমার—
আমি যে শিবের চ্যালা,
ছাই ঘষে ঘষে কি আয়নাকে ভাঙা যায়—
বরং চকচকে করে আরও।

১৯

আসছিল সবাই তারা, ক্রমে এসেছিল;
চলে গেছে, ক্রমে চলে গেছে।
রাত-দিন, এই আসা যাওয়া চলতে থাকে;
কোথা থেকে এসে কোথা কেন যায়— না থেকে না হয়ে না-এ।

২০

তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়েও অন্ধের ভান করো,
সেজে থাকো বধির সজাগ কান নিয়ে,
সহ্য করো সহ্য করো, নম্রস্বরে কথা বলো:
পৌঁছোবে সত্যের কাছে।

২১

ওরা অপমান করে, অভিশাপ দেয়—
ফুৎকারে উড়িয়ে দিই ওসব চিৎকার,
যদি ফুলমালা নিয়ে আসে ওরা— আমল দেব না,
আমি চলি এসব গায়ে না মেখে।

২২

দিন অবসান হলে রাত্রি জ্বলে ওঠে।
ধরণী আকাশ ছোঁবে বলে ফুলতে থাকে।
চাঁদ সে রাহুকে গিলে খায়।
শিবকে ডাকো— এটাই তো মোক্ষম সময়, আত্মদীপ হও!

২৩

মন জীবনের এক অপার সাগর—
ক্রোধের আগুনে ঢেউ বঁড়শির মতন গেঁথে দগ্ধ করে,
তুমি দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখো—
এসব সত্যের কাছে নিছক নির্ভার।

২৪

খ্যাতি ফুটো পাত্রে রাখা জল।
একটা লোক দেখাও তো, যে মুঠোয় ঝড় ধরতে পারে
অথবা দাঁতালকে বাগে আনতে পারে একটা চুলে—
মনে হয়, সে-লোকটাই খ্যাতি ধরে রাখতে পারবে।

২৫

যতক্ষণ-না উঠেছে চাঁদ— ষড়-বনের ভেতরে টাট্টু ছুটিয়েছি,
আকাশের শ্বাস গান গাইছিল আমার মধ্য দিয়ে
আর শরীরের ভাপে শুকিয়ে যাচ্ছিল,
প্রেমের আগুনে হৃদি পুড়িয়ে পেয়েছি আমি শংকর তোমাকে।

২৬

মনঘোড়া আকাশ বাতাস ফেড়ে
পলকে পেরিয়ে যায় কয়েক যোজন পথ,
মনীষার লাগাম পরাই তাকে
এ-শ্বাসরথের চাকা তবেই-না হবে বশ।

২৭

পান ও ভোজন দামি পোশাকে মেলে না শান্তি,
বিভ্রম ছেড়েছে যারা তারাই পৌঁছেছে তুঙ্গে—
তারা জানে মৃত্যু হল মুখোশের আড়ালে আগুন
আর লোভ হল দেঁতো হাসির সুদের ব্যাপারী সে।

২৮

ততটুকু ঢাকো যতটায় শীত হার মানে—
শুধু ততটুকু খাও যতটায় খিদে বশ মানে,
ওরে মন, স্বপ্ন দেখো নিজেকে ছাড়িয়ে বাইরে এসে—
তুই মনে রাখিস, এ-দেহ তোর ঠুকরে খাবে জঙ্গলের কাক।

২৯

সত্যকে পাবে না খুঁজে শ্বাস চেপে দু-পা ফাঁক করে—
নেবে না মুক্তির দ্বারে তোমায় দিনের স্বপ্ন সব,
লবণ যতই তুমি গুলে দাও জলে
হবে না তো সমুদ্র কখনো।

৩০

লোভকে মারো, দিবাস্বপ্ন ছেড়ে
এখন সত্যের দিকে ফেরো,
এইখানে উদ্ভাস মনীষার—
এক শূন্য মিলছে সে পরম শূন্যে।

৩১

যখন মনের আরশি থেকে মুছে দিই সব ধুলো
লোকে জানল আমি তাঁর প্রেমে পাগলিনী,
যখন এল সে খুব কাছে
দেখি সে-ই সব— আমি অতি অকিঞ্চন।

৩২

কেউ কেউ জাগরূক দু-চোখ বুজেও—
কেউ কেউ বিশ্ব চষতে গিয়ে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে—
কারো কারো ময়লা পুণ্যবারিতে স্নানের পর রয়ে যায়—
দু-হাত আবার কারো অমলিন যদিও ঘরেতে থাকে।

৩৩

তিনি তো চেনেন আত্মারামের মন্দির আর মাথার মুকুট,
তাঁর শ্বাস গভীর এবং অনাহত,
মোহ থেকে মুক্ত তিনি, ঈশ্বরকে সম্যক জানা তাঁর।
তবে তিনি অর্চনা করবেন আর কাকে?

৩৪

প্রথম স্বরের উদ্ভাসন তাঁর নাভি থেকে—
শ্বাস তৈরি করে যা গড়েছে স্বর্গ,
তিনি এক মন্ত্রই জপেন
কী হবে হাজার মালা জপে!

৩৫

এই জন্ম-মৃত্যুর ধরায় এসে
নিজেকে পেয়েছি আমি মনের আলোকে,
না আমি, না অন্যজন— কেউ মরবে নাকো—
মরণে কী সুখ আহা, কী সুখ বাঁচায়!

৩৬

থান থেকে থানে গুহ্যসাধক বেদম হয়ে ঘোরে।
আরশিতে দেখ-না তোর মন,
মোহপিরিতের তীর্থযাত্রায় কেন রে
মজলি নিরর্থক!

৩৭

যদি কষে দিতে পার লাগাম নিজের শ্বাসে,
তবে জেনো, ক্ষুধা তৃষ্ণা ছোঁবে না তোমায়,
অন্তিম অবধি করো শাসন তোমার শ্বাস
তবেই সফল হবে এ-সংসারে তুমি।

৩৮

দাবানল নেভানো, বন্যাকে বাঁধা
অথবা হাওয়ায় হাঁটা বা কাঠের গাই দোয়া—
এসব যে পারে,
সে আসলে নকলনবিশ।

৩৯

কোন সে মালিনী আর মালী মালা গাঁথে?
কোন ফুল তুলে, কোন জল দিয়ে
তারা তাঁর পূজার্চনা করবে?
কোন মন্ত্রে জানবে তারা গহন আত্মকে?

৪০

মন যেন এক মালী, সুখের কামনা তার বধূ—
দুয়ে মিলে ভজনার ফুল তোলে তারা।
চাঁদ থেকে ক্ষরিত অমৃত সেচে
জাগায় ফুলের মতো গহন আত্মকে নীরবতার সে-মন্ত্রে।

৪১

এলাম পথের কোন দিশা দেখে, কোন দিকে যাব,
কী করে আমার পথ খুঁজে পাব ভাবি!
বিলম্ব হওয়ার আগেভাগে তারা মানচিত্র পাঠাবে।
অথবা অন্তিম শ্বাস পড়বে শুধু আমার সবের অবসানে।

৪২

দিন শ্বাস বায়ু রাত্রি আকাশ পৃথিবী
শস্য ও চন্দন— তুমি সব,
আকর আমার অর্চনার— সেও তুমি।
কী দেব তোমায় বলো আর?

৪৩

কাম ক্রোধ লোভের দস্যুকে মারলে—
তুমি জগতের কত উপকার করবে,
কী করে পৌঁছোতে হয় শিখরে তা বুঝবে,
দেখতে পাবে জগৎ আদপে ছাই দিয়ে গড়ে তোলা।

৪৪

নিজে মধ্যে সেঁধিয়ে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছ,
সারাদিনমান খুঁজে খুঁজে দেখি যখন লুকিয়ে আছ আমার ভেতরে—
তখন আমি যে বন্য, ছুট লাগিয়েছি।
এখন আমার সঙ্গে খেলো— খেলা এখন এটাই।

৪৫

কুশ ফুল তিল জল দীপ— এরা নিছক তালিকা কারো কাছে,
বাস্তবিক যে শুনেছে গুরুর নিকট আর ডুবেছে প্রত্যহ
শম্ভুতে, নিজেকে মুক্ত করছে ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার শিকল থেকে,
সে পুনর্জন্মের যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাবে।

৪৬

তুমি হাসলে সেও হাসে, হাঁচে সে তোমার স্বপ্নে,
হাই তোলে, কেশে কেশে ওঠে,
ডুব দেয় তোমার ভাবের সিন্ধুজলে,
সে নগ্ন তোমার পায়ে পায়ে হাঁটে, তোমার নিজের পরিচয় দাও তাকে।

৪৭

এই জলাশয়ে একটা সরিষার দানাও ডোবে না
অথচ সবাই আসে এখানে প্রার্থনা করতে।
এদিকে জন্মায় ধূম্র হাতিরা হরিণ আর শেয়াল গণ্ডার—
যারা বড়োজোর জন্ম নেয় আর এই হ্রদে ডুব দিয়ে স্নান করে।

৪৮

নিজেকে জড়িয়ে নিজে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছি আমি—
আমি লাল্লা, তাঁকে খুঁজতে গিয়ে সব হারানোর পর
ধরেছি অমিত শক্তি। তাঁর কপাটের খিল টেনে
দুয়ার করেছি বন্ধ চাউনি দিয়ে আর চেয়ে আছি।

৪৯

ঝেড়েছি মনের ধুলো যত—
হৃদয়ে চালাই ধার ছুরি—
আলুথালু শাড়িতে দরজায় তাঁর গিয়ে হত্যে দিই,
তখনই ফিরেছি মুখে মুখে আমি, লাল্লা।

৫০

আমি বার তিনেক দেখেছি একটা হ্রদ উপচে যাচ্ছে অন্য আর-এক হ্রদকে—
একটা হ্রদকে একবার আকাশে আয়না হতেও দেখেছি—
উত্তরের হারামুখ পাহাড় ও দক্ষিণের কাসুর হ্রদটিকে সে জুড়েছে—
সাত বার একটা হ্রদকে নিঃস্ব হতে দেখা গিয়েছিল।

৫১

মায়ের জঠর থেকে সুন্দরের দিকে তারা ঝাঁপ দিল, আর
বার বার আঘাতে আঘাতে দীর্ণ করেছে পিছল সেই পথ।
তারা ফিরে এসেছে আবার সে-দুয়ারে,
কিন্তু এই বার্তা মনে রেখো— শিবকে ধরার খেলাটা খুব শক্ত।

৫২

যে-পাথরে গড়া এই মন্দির, পথ সে এক পাথরেই গড়া—
সেই পাথরই তো এই ধরার অঙ্কুশ—
সেই পাথরের জাঁতাকলে পিষে যাচ্ছ তুমি,
কিন্তু মনে রেখো— শিবকে ধরার খেলাটা খুব শক্ত।

৫৩

সূর্য কি দেয় না তাপ, যেখানেই যায়?
না কি শুধু বড়োলোককে ছোঁয়?
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে জলে ভরে যায় সমস্ত বাড়ির ঘড়া,
কিন্তু মনে রেখো— শিবকে ধরার খেলাটা খুব শক্ত।

৫৪

দুধ দেয় মা হয়ে, আহ্লাদ দেয় পত্নী হয়ে,
প্রলুব্ধকারিণী হয়ে গ্রীবাদেশে নাক ঘষে:
এটুকু তোমার কাছে মেয়েমানুষের মানে,
কিন্তু মনে রেখো— শিবকে ধরার খেলাটা খুব শক্ত।

৫৫

কেউ ঘর, কেউ হয়তো মাঠ ছেড়ে পালিয়েছে।
যে-জমিন রয়েছে পতিত
ফলে না ফসল তাতে কোনো,
শ্বাসের চলন গোনো রাত্রি-দিনজুড়ে।

৫৬

হে গুরু পরমেশ্বর, বলো গুহ্য কথাটি আমাকে—
কখন দু-জন জাগলে নাভির নীচের সূর্য থেকে?
প্রশান্তিতে কেন শ্বাস হ্রস্ব হয়ে যায়—
কেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে— কেন সে পোড়ায়?

৫৭

নাভির নীচে সে সূর্য, লিখন ছিল যে তার দাহ।
সেই খাদ থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস
ঠোঁট বেয়ে বার হল, পোড়াল আমাকে।
যখন মুকুটে জন্ম নিল চন্দ্রদরিয়া— শান্ত ও হ্রস্ব হল শ্বাস।

৫৮

আমার হাতের সব কর্মই অর্চনা,
আমার জিভের সব ভঙ্গিই প্রার্থনা,
এটাই শিবের শিক্ষা— গোপনে পেয়েছি।
এটাই পোশাক, চামড়া একেই জেনেছি।

৫৯

না আমি না তুমি, বস্তু নয় ধ্যান নয়—
বিভোর নিজের স্বপ্নে তিনি।
কেউ কেউ বোঝে,
যে বোঝে সে তাঁর স্রোতে মিশে যায়।

৬০

নিজেই নিজেকে জাপটে দেখছি।
কেউ কি এমন করে নিয়ম ডিঙোতে পারে?
নিজের ভেতর আমি নিজেকে হারিয়ে পেয়ে গেছি এক শুঁড়িখানা,
ঘড়া ঘড়া এত যে অমৃত, এতে চুমুক দেওয়ার কেউ নেই?

৬১

যা শুরু করেছি, তাকে শেষ করব।
হিসেব-নিকেশ করা অন্য কারো মাথাব্যথা।
তোমার নিজের কাছে পুরস্কার রাখো, আমি নিজেকেই বিলিয়েছি শুধু।
যেখানেই যাই, খ্যাতি পথের বিষাক্ত কাঁটা যেন।

৬২

যদি কর রাজত্বের আকাঙ্ক্ষা, তাহলে ধরো তরবারি।
আর স্বর্গ চাইলে, দাও আত্মাহুতি অপরের জন্য।
জানতে চাও নিজেকে? গুরুকে শোনো তবে।
নিজের যা-কিছু পাপ-পুণ্য তার জের জানতে নিজের সঙ্গেই কথা বলো।

৬৩

জ্ঞানের বাগানে আত্মসংযম সুকার্য আর বৈরাগ্যের বেড়া দাও,
সেখানে আগের সব ভুলকে ছাগলের মতো চরে খেতে দাও—
কাননের সব ঘাস যাতে সে মুড়িয়ে খেতে পারে,
তারপর বলি দাও মায়ের পুজোয়, মুক্ত হবে এভাবেই।

৬৪

গৃহী আর ত্যাগীতে তফাত নেই:
সময়ের নদীতে ভাসিয়ে দিতে পার যদি লোভ—
দেখবে তিনি সবখানে পূর্ণ।
যেরকম করে জানবে, সেরকম হবে।

৬৫

শিবকে ডাকে যে পারে, কেননা, তিনি হাঁটেন হংসের পথ ধরে—
না করে ফলের আশা পোঁতেন যে গাছ—
এ-বিশ্ব কত-না ব্যস্ত রাখেন রাতে ও দিনে—
তিনি গুরু, তিনি উজ্জ্বলতায় জেতেন, সব দেবের প্রথম তিনি।

৬৬

নিজেকে খণ্ডিত করে তুমি মাপ তার গভীরতা।
কিন্তু বীজ পুঁতলেই কি ভাব ফলে?
এত বোকা, তোমাকে শেখানো যেন খাম্বার উদ্দেশে ঢিল ছোড়া,
আর দুধ পাব ভেবে বলদকে খাওয়াতে চাওয়া গুড়।

৬৭

তোর জন্য কান্না পেল মন,
সবই তো হারালি মরীচিকার পেছন ছুটে ছুটে।
শুধু তো নোঙর নয়—
সময় সে ছায়াটাকেও যে উপড়ে নিয়ে যায়।

৬৮

আমি লাল্লা, আমার মনের জুঁই ফুল বন পার হয়ে দেখি
শিব শক্তি মজে একে অপরের সঙ্গে।
আনন্দে মাতাল আমি ডুবেছি অমৃত হ্রদে,
জন্মান্তর পেরিয়ে এসেছি আমি অমৃত সারস এক।

৬৯

আমি মনঘোড়াকে করেছি বশ লাগাম পরিয়ে,
গলদ্‌ঘর্ম হয়েছি শ্বাসের দশপ্রবাহ একত্রে বাঁধতে:
এভাবেই চাঁদ গলে অমৃত ক্ষরিত হয় আমার ওপর,
শূন্য মেশে পরম শূন্যে।

৭০

মনকে মৃত্যুঞ্জয় হতে শিক্ষা দাও,
আগলাতে না পারলে দিনে দিনে যা দানব হয়ে যাবে।
নিঃশঙ্ক না হলে মন
নিতান্ত চঞ্চল শিশু, যে মায়ের কোলে বসে শুধু দুধ খেতে চায়।

৭১

মারো কাম ক্রোধ লোভ নামের রাক্ষস যত,
না হলে তোমার বুকে তির গেঁথে দেবে।
চিন্তনের অস্ত্রে সাজো, নিজেকে বাঁচাও নীরবতার কঠিন ঢাল দিয়ে,
অচিরেই টের পাবে কত তুচ্ছ ওরা।

৭২

ওগো ও চঞ্চলমতি,
চিত্তটাকে ভয় দিয়ে কলুষ কোরো না।
অসীম সে জানে তুমি কী কারণে ভুখা,
তাকে বলো এখন তোমায় পারাবার করে দিতে।

৭৩

রাজার চামর, হাওদা, রথ, সিংহাসন
সন্ধ্যে বেলা নাটকে জমাটি সমারোহ আর মখমল বিছানা—
এর মধ্যে কোনোটা কি
মৃত্যুর গহন থেকে ভয়কে শুষে নিতে পারবে?

৭৪

বিভ্রমের দাস তুমি নিজেই নিজেকে ছুড়ে দিয়েছিলে
জীবনসমুদ্রে যেন ভাসমান জাহাজের মতো,
বাঁধ ভেঙেছিল আর ছায়ার দলদলে ডুবে গেছ।
যমের চ্যালারা এলে কে তখন মরণের ভয় শুষে নেবে?

৭৫

তোমার কর্ম দু-ধরনের আর ধরায় রয়েছে তিনটি দূষিত কারণ:
ধ্বংস করো সব শ্বাসবহ্নিতে তোমার—
নইলে এরা তোমাকেই মারবে,
ডানার ঝাপটে সূর্য ফুটো করে দিতে পারলে মরণের ভয় উড়ে যাবে।

৭৬

মনীষার সাজ পরো,
বুকে নাও লাল্লার বচন,
আত্মদীপ হয়ে জ্বলো:
তুমি হবে মুক্ত।

৭৭

বলির ভেড়ার মতো জাগাও ইন্দ্রিয় পাঁচটি,
মনের জমির দানা খেতে দাও আর ভগবানের বরাদ্দ রুটিগুলো
তারপর শেষ করো— তাড়াহুড়ো নয়,
মনীষায় পৌঁছোতে নিয়ম ভাঙো, অমরাবতীর গুপ্ত দরজার সন্ধান করো।

৭৮

ঘুমিয়ে কে, কে-বা জেগে? কী বলত আকাশে ওই হ্রদটা,
যার থেকে ঝরে পড়ে অমৃতের বৃষ্টি।
শিব কি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসে!
সাধনের গুহ্য পুথি খুঁজে জপছ কোন সে চূড়ান্ত মন্ত্র।

৭৯

মন থাকে ঘুমিয়ে, যখন করে সে বুদ্ধিকে অতিক্রম, জাগে।
পঞ্চেন্দ্রিয় যেন নভে চড়া হ্রদ—
অমৃত যেখান থেকে ঝরে পড়ে।
আত্মজ্ঞান ভালোবাসে শিব— গুহ্য সাধনার অন্তিম অক্ষর শিব।

৮০

শ্বাসকে বশ মানাতে পারতাম, যদি মনকে শিক্ষা দিতে পারি—
শল্য যেন, কেটে ফের পুল্টিস লাগিয়ে ব্যথা উপশম করি।
আহা, যদি জানতাম মন্থন করে জীবনের স্পর্শমণি হতে।
কিন্তু মনে রেখো, শিবকে ধরার খেলাটা খুব শক্ত।

৮১

কতবার যে সিন্ধু নদের মদে মাতাল হয়েছি—
এই মঞ্চে কত ভূমিকায় যে করলাম অভিনয়—
কত মানুষের মাংস ভক্ষণ করেছি—
কিন্তু সব শেষে এসে, আমি লাল্লা, একই রয়ে গেছি।

৮২

এ-মন হুংকার দিয়ে উঠেছিল, অনাহত ওম ধ্বনি তুলে,
আমার শরীর ছিল জ্বলন্ত অঙ্গার,
আর ছ-টা রাস্তাকে সপ্তমে নিয়েছিল— এভাবেই যেন লাল্লা
পৌঁছোল আলোর পথে।

৮৩

ঝরে পড়া শীতের পাতার মতো
এক সন্ন্যাসীকে আমি দেখেছি— ক্ষুধার্ত আর শীর্ণ,
মস্ত বোকা লোকটাকে দেখেছি তার রাঁধুনিকে সে পেটাচ্ছে।
অপেক্ষায় আছি তার, যে এসে বাঁধন কাটবে পাগল ধরার সঙ্গে।

৮৪

পারিনি বিশ্বাস করতে এমনটা যে ঘটবে:
হুপি পাখি ঠোঁট দিয়ে আমার এ-নখ উপড়ে দেবে,
আমার স্বপ্নের সত্য আমাকে একঠাঁই করে দেবে,
আমি লাল্লা— নিজেকে পেলাম খুঁজে কূলহীন হ্রদে।

৮৫

যা ঘটল বিশ্বাস করতে পারিনি তো—
তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি সব, আলোর নিশানা নেই কোনো,
আনাড়ি মিস্ত্রিকে দিয়ে ছাদ থেকে মেঝে সারিয়েছি।
দেখাও সঠিক দিশা, হবে গো নিজেকে জানতে।

৮৬

তোমার স্বরের দশা এরকম হল কেন, ওগো রাজহংস,
কে বা কারা তোমায় করেছে চুরি— সেটাও পারছ না বলতে?
জাঁতাকল পেষা বন্ধ করেছ, গলাটা ওর চেপে আসছে যেন—
দানাপানি কোথায়? নিকিয়ে নিয়ে গেছে কেউ সব।

৮৭

জঠরে বসে যে-কথা দিয়েছিলে তুমি—
বলো, রাখবে নাকো সেই কথা?
মরণ হনন করবে— তার আগে মরো,
তবেই যাবার পরে মান পাবে।

৮৮

সামলান আপনার গাধাটাকে—
না হলে চিবিয়ে খাবে পড়শির জাফরান খেত,
হাড়িকাঠে তখন আপনার গলা যাবে—
কেউ তো অন্যের হয়ে বাড়াবে না গলা।

৮৯

চুপ করে আছি, নিরুপায় দুঃখী আর নিঃস্ব আমি—
কিছু কি আমার থেকে কিনবে?
বার বার ফিরে আসি, উচ্চস্বরে হাহাকার করি—
বুক-ভরা শ্বাস, আত্মা জাগরূক— এক মূল্যে দুটি।

৯০

বুঝেছি গো, পেঁয়াজ রসুন দুইই এক—
ভাজা পেঁয়াজের স্বাদ নেই।
দেহের সাধনে সুখ নেই,
তবু টের পেলাম তুমিই আমি।

৯১

গুরুকে শুধোই, মনে আছে,
জগৎ কেমন ছিল আগে?
বাচ্চারা, বলো তো দেখি, কীভাবে কাটাবে রাত-দিন?
দিনে দিনে জীবন কঠিন হয়ে যায়।

৯২

খারাপ খবর একটা, একটা আরও খারাপ খবর:
শরতে নাসপাতি আর সমস্ত আপেল পেকে যাবে,
খুবানিগুলোও পাকবে গরমের বৃষ্টিজল পেয়ে,
অচেনা লোকের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে মা-মেয়ে বেরোবে বাইরে।

৯৩

নতুন চাঁদের মতো মন—
দেখেছি নতুন করে জন্মাচ্ছে সাগর—
যবে থেকে দেহ আর আত্মাকে মেজেছি
আমি লাল্লা, হয়েছি নতুনতর।

৯৪

গুরুর নিদান হল—
তুচ্ছ করে বাহির অন্তর জানতে হবে।
আমি লাল্লা, এই দীক্ষা বুকে নিয়ে
সেই দিন থেকে নাচ করেছি উদোম হয়ে।

৯৫

পাঁচ, দশ, এগারো— এদের নিয়ে কী যে করি?
নিকিয়ে পালাল কেউ এই হাঁড়ি। সংখ্যার খেলায়
না মেতে আপ্রাণ সব নিয়ে একই দিকে টান দিলে
খুঁটা ছেড়ে পালাত কি ধবল গোরুটা।

৯৬

শান্ত নদী বইছে এই মুহূর্তে যা দেখি,
পরের মুহূর্তে দেখি সাঁকোটি বানের তোড়ে ভেসে গেছে।
ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে জঙ্গল এখন,
না গোলাপ না কাঁটা— মুহূর্তে দেখি কিছু নেই।

৯৭

দেখতে পাচ্ছি চুল্লি জ্বলছে,
আগুন অথবা ধোঁয়া পরক্ষণে কিছু নেই।
এখুনি দেখেছি পাঁচ রাজকুমারের মাকে,
আবার এখুনি দেখি যাঁকে, তিনি কুমোরের বউয়ের খুড়িমা।

৯৮

এলাম যে-পথে, বাছিনি তা।
দিন চলে গেল, আমি মনের বাঁধের ’পরে এসে
চাইলাম থলির দিকে। কী দেব পারানি, শিব
তোমায় পেলাম না তো খুঁজে।

৯৯

প্রবজ্যা, আমাকে তুমি ঘোরাও তোমার চরণেতে।
এখনও সময় আছে, বঁধুয়াকে খোঁজো।
ডানা হও, ওড়ো।
এখনও সময় বাকি আছে, খুঁজে নাও বঁধুয়াকে।

১০০

নিজেকে জ্বালাও শ্বাস টেনে
কামার যেমন করে সশব্দ হাপরে টান দেয়,
লোহাকে পুড়িয়ে সোনা গড়ো।
এখনও সময় আছে, খুঁজে নাও বঁধুয়াকে তুমি।

১০১

দেহের দরজায় খিল এঁটে আমি শ্বাস বন্ধ করেছি নিজের,
এভাবে পেঁয়াজ-চোরকে ফাঁদে ফেলা গেল।
আমার আত্মার অন্ধ কুঠুরিতে শিকলে বেঁধেছি তাকে
আর ওম নাদের চাবুকে তার চামড়া ছাড়িয়েছি।

১০২

আমি লাল্লা, ফেটে যাওয়া শিমুলের তুলো—
সাফাইওয়ালা সে ছিঁড়েছে আমাকে আর ধুনুরি ধুনেছে।
দেখতে পাচ্ছ না কি ওই তন্তুজাল, ওটাই ছিলাম আমি—
চাকা থেকে ছাড়াল জোলার বউ, মাকুতে টাঙিয়ে দিল জোলা।

১০৩

আমায় প্রথমে ধোপা আছাড় মেরেছে—
তারপর থুপিয়েছে সাবানে মাটিতে—
এরপর দর্জি সে মেপেছে আর কাঁচিতে করেছে ফালা ফালা—
আমি লাল্লা, এভাবেই জেনেছি স্বর্গের রাস্তা।

১০৪

এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করিনি—
নিজের ভাষ্যের মদিরায় ডুবে গেছি,
আঁধারের সঙ্গে কুস্তি করে
মেরে শুইয়ে দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছি, করেছি শত টুকরো।

১০৫

জ্যোৎস্না নিভে যেতে পাগলিনীকে ডাকলাম,
ছোঁয়ালাম ঈশ্বরের প্রেম দেহ মনে।
লাল্লা, আমি লাল্লা, তাঁকে ডাকলাম চিৎকার করে করে—
স্ফটিক সাগরে ডুবি তাঁকে নিয়ে তারপর আমি।

১০৬

একটা দড়ি দিয়ে শুধু অথই সাগরে নৌকা টানছি,
সে কি ডাক শুনতে পাবে আর রক্ষা করতে আসবে?
নাকি আমি আধপোড়া ভাণ্ডের থেকে চুইয়ে পড়া জল?
কী আশ্চর্য, হায় দুঃখী হৃদয়, ফিরছ না ঘরে তুমি।

১০৭

ও ভাই, বালির দড়ি টানছ যে অমনভাবে তুমি—
দাগের ওপর এটা দিয়ে নাও কী করে এখন টানবে?
যে-দিশা দিয়েছে নারায়ণ—
কেউ কি ঘোরাতে পারে তাকে?

১০৮

কাঁধে যে মিষ্টির ধলি, তার গিঁট ঢিলে হল, ভারে ন্যুব্জ আমি।
ভুল পথে এসে পড়ে দিনটাই বরবাদ হল আজ।
কী যে করি, সব গেল আমার, গুরুর মানা যেন
কশাঘাতে পড়া ফোসকা। এ ভেড়ার পালের রাখাল নেই কোনো।

১০৯

চাঁদ দেখতে বার হয়ে
আলোর উড়াল দেখি আলোর সমস্ত দিকে চেয়ে।
নারায়ণ, সবই নারায়ণ!
ওগো ভগবান, ঘূর্ণি করেছ আমায়।

১১০

ওই যে তোমার বাগানের যত আগাছাগুলোকে সাফ করে
অনুপম নার্গিস ফোটাও,
অমোঘ মৃত্যুর পর সমস্ত হিসেব চাইবে।
তহশিলদার হয়ে মরণ যেন সে পড়ে রয়েছে পেছনে।

১১১

এ-ব্যথা নীলিমা খোঁজে হৃদয়ে ঘুঘুর বাসা ছেড়ে দিয়ে।
হাতে চোট পেয়েছি অন্যের ঘর সারানোর কাজে।
তোমায় তোমার ঘর থেকে নিয়ে যাবে বলে যারা সব সারি করে এল,
তোমাকে মাঠের মধ্যে ফেলে গেছে তারা। আমি ঘুমোলাম দক্ষিণে তোমার।

১১২

আমার হৃদয় যেন ভুখা হস্তিনীর মতো, প্রহরে প্রহরে
খিদে লাগে যাদের। ভাগ্যিস লক্ষ-কোটির ভেতর থেকে
দু-একটা ক্ষুধার্ত বেঁচে যায়,
নইলে সৃষ্টি রসাতলে যেত।

১১৩

নরক ছাড়িয়ে নাচ তুমি—
কী করে অমনটা পার?
খাওয়া-শেষে অবশিষ্ট খাদ্যকে পার না যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে,
কী করে এমন মজা করে খাও তবে?

১১৪

আমার কাঠের ধনু তাক করে বাঁকিয়েছি, কিন্তু তিরগুলো তো ঘাসের।
রাজার বাড়ির কাজে ছুতোরের মূর্খামিতে খুঁত লেগে গেল।
ভিড়ের বাজারে তালাহীন এক দোকান আমার।
সর্বস্ব হারানো এই আমাকে ছোঁয়নি গো পুণ্যবারি।

১১৫

এ যেন গাধাকে মিছরি খাওয়ানোর মতো—
খুলো না মূর্খের কাছে মুখ,
কী-বা হবে বালির চড়ায় গাছ পুঁতে
অথবা গাইয়ের জন্য রাখা যে তুষের ঢিবি, তাতে তেল ঢেলে?

১১৬

দিতে পারি উড়িয়ে দখিনা মেঘ আমি—
সাগর শুকিয়ে দিতে পারি—
বৈদ্য সেজে দিতে পারি সারিয়ে প্রবল জ্বর,
পারব না মূর্খের কাছে মুখ খুলতে শুধু।

১১৭

তেতোটাও মিষ্টি লাগে আর মিষ্টিটাকে লাগে বিষ—
কী চায় তোমার জিভ, সেটাই আসল।
এটা বলা কঠিন যে, শুধু চেয়ে যাও
এই রাস্তা পেরোলেই সাধের নগর পাবে তুমি।

১১৮

লক্ষ বার ধরে আমি গুরুকে বলেছি—
যত কিছু 'না' আছে, তাদের নাম দিন একটা।
হাল ছেড়ে দিয়েছি অগত্যা তারপর,
তুমি-বা কী নাম দিতে পার— কোথা থেকে নাম সব উছলে এল।

১১৯

ভেবো না খ্যাতির মোহে এসব করেছি আমি।
ভালো কিছু হবে তার তোয়াক্কা করিনি।
খিদে কী তা জানি, জানি দুঃখ আর ঈশ্বরকেও।
আমি সদা সজাগ থেকেছি শুধু।

১২০

নেই-নগরের এক সরাইখানায় সে অতি ভোজনের সেরা পাতটি পাতা।
উপবাস তোমাকে দেমাকি করে ছাড়বে।
চরমপন্থার দাস, তুমি সমতার শিল্প শেখো—
হাতের পরশে তবে সব বন্ধ দরজা হাট হয়ে খুলে যাবে।

১২১

ঝঞ্ঝা আর বিদ্যুতের চকিত ঝলক সহ্য করা—
কিংবা পথ হেঁটে যাওয়া মধ্যাহ্নে যখন ঘোর আঁধার নেমেছে—
আর জাঁতাকলে ফেলে নিজেকে গুঁড়িয়ে নেওয়া—
এভাবে শিখেছি, স্থিতিস্থাপক আমাকে হতে হবে।

১২২

শরীর শরীর করে মরছ—
শরীরটাকে মাজছ খালি—
দামি দামি কত-না পোশাকে সাজছ তুমি—
তবু এই শরীর অন্তিমে গিয়ে শুধু ছাই।

১২৩

সত্য মন, নিজের ভেতর দেখো
ওরা ওই দেহকে স্বয়ং-এর নিজ-রূপ বলে ডাকে।
লোভ আর লালসাকে ফেলে
শরীর সূর্যের মতো সোনার বরন করে মাজো।

১২৪

খিদে আর তৃষ্ণায় শরীর জ্বালিয়ো না,
শুধু তুমি পতনের সময় দু-হাত আলগা করে ধরো।
জপ-তপ যা-কিছু তোমার, তাকে চুলোয় পাঠাও—
অন্যকে দেখার মতো অর্চনা জীবন ব্যাপে আর-কিছু নেই।

১২৫

ভালো মন্দ সমস্ত স্বাগত,
চোখ দিয়ে দেখি না, না-শুনি কান দিয়ে
হৃদিপদ্মে এক স্বর জাগে,
শত ঝঞ্ঝাতেও এই রত্নদীপ আমার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে।

১২৬

লাজের শিকল খসে পড়ে,
যদিও বিদ্রূপ আর অভিশাপ চুরি করতে পার।
যদি এ-মনের বুনো ঘোড়াকে গুঁড়িয়ে দিতে পার
লজ্জার পোশাক তবে জ্বলে উঠবে লেলিহান হয়ে।

১২৭

এত তীব্র প্রার্থনা করেছি জিভ তালুতে জড়িয়ে গেছে,
তবু ঠিক করে ডাকতে পারিনি তোমায়।
মালা জপতে জপতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীতে পচন ধরেছে,
আমার মনের দ্বৈত যায়নি তবু।

১২৮

গুরু, এই তাল পাতা ভূর্জপত্র।
খাঁচার ভেতরে বসে নাম-জপা তোতাকে খাওয়াও।
হা কপাল! ওরা গীতা আওড়ে চলে নানা অজুহাতে।
সেই তো আসল পুথি, যা আমার মাথার ভেতরে খেলা করে।

১২৯

পালন করার চেয়ে পুথি পড়া সহজ অনেক।
নিজেকে জানার চেয়ে ঢের সোজা দার্শনিক হওয়া।
মুছে যায় অক্ষর ধ্যানের ঘন কুয়াশায়।
দ্বিতীয় দেখায় আমি খাই যে হোঁচট।

১৩০

শাস্ত্র পড়ে যা পালন করার করেছি—
শাস্ত্রে যা নেই, তা নিজে নিজেই শিখেছি—
গভীর অরণ্যে গিয়ে লড়েছি সিংহের সঙ্গে—
শিখিনি কখনো আমি মনে মুখে দু-রকম হতে।

১৩১

মুষল ঘোরাও কেন চোখ বেঁধে দিয়ে,
আমাকে বিশ্বাস করো, সে এখানে আছে—
দেখো-না না-হয় নিজে এসে,
এদিক ওদিক আর ফিরতে হবে নাকো।

১৩২

কে মরে? কাকে-বা মারে?
যে অস্পষ্ট জাগতিকে ঝাঁপ দেয়—
তার নাম মুছে যায়,
সে মরে, তাকেই মারে।

১৩৩

গুরুর ওপরে যে বিশ্বাস রাখে
মনীষার বলে মনঘোড়ার রাশ সে টানে,
মরে না সে—
তাকে মারা অসাধ্য সবার।

১৩৪

ধীরে ধীরে জাঁতাকল ঘুরছে,
চক্রপথে ঘুরছে, পাথরের অক্ষ গোপন রেখেছে সব—
কখনো চাকার দাঁত শস্যদানাদের পিষে দিচ্ছে,
কখনো চাকার কাছে আসছে দানাগুলো।

১৩৫

সমস্ত জায়গায় দেখি শিব।
সে জানে, মানে কী হিন্দু-মুসলমানের।
সেই যে স্বয়ং, যাঁর বসত তোমার আর সবার ভেতর,
সেই শিব— শিবকে জানো তুমি।

১৩৬

বোকা রে, পুস্তকে তুই পাবি না পথের দিক-দিশা,
দেবে না দেহের গন্ধ কোনো সূত্র তোকে,
ধ্যান দে নিজের প্রতি তুই:
এটাই উত্তম উপদেশ।

১৩৭

কে-বা রুখতে পারে তুষারের গলে যাওয়া—
কে পারে তালুতে ঝড় তুলতে।
সে পারে— যে জানে পঞ্চতন্ত্র,
যে আঁধার থেকে সূর্য ছিঁড়ে আনতে পারে।

১৩৮

তোমার লজ্জাকে ঢাকে, শীতের কাঁপুনি থেকে রক্ষা করে।
ও শুধু তো ঘাস আর জল খেতে চায়।
হে পূজারি, তোমার পাথরকে
এসব সজীব খাদ্য খাওয়াতে তোমায় শেখাল কে?

১৩৯

হৃদয় প্রেমের খলে গুঁড়িয়েছি আমি,
তারপর ঝলসিয়ে খেয়েছি।
নিজেকে রেখেছি শান্ত।
তুমি বাজি ধরতে পার— জানি না রইব কী মরব।

১৪০

সেঁধিয়ে তোমার চামড়া আর হাড়ে
তিনি পেতেছেন বিশ্বজোড়া এক ফাঁদ,
যদি চেতনায় তাঁকে খুঁজে না পাও গো
ভেবো না মরার পর পাবে।

১৪১

তাকে দেখতে চৌদিকে দাপিয়ে বেড়িয়েছি
আমাকে ঘিরেই আছে সে তো,
এমন সত্যকে লাল্লা পেয়েছে হাজার কথা ছেঁচে
ওহে ও পাগল, তুইও মাত এইভাবে।

১৪২

সব যুক্তি আর অনুভব ফেলে দিয়ে
আমি একা পেরিয়েছি অসীম শূন্যতা।
গোপনীয়তার কাছে সব পদস্খলন আমার জমা রেখে
আমি কুসুমিত, যেন জলায় ফুটেছি পদ্ম হয়ে।

১৪৩

এখানে ছিলাম আগে, এখানে আবার আসব,
সময়ের সূচনা থেকেই এই এখানে রয়েছি।
সূর্য ওঠে — অস্ত যায়— আবার আবার ওঠে,
শিব সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে, পুনরায় গড়ে।

১৪৪

তাঁকে দেখো, কত-না ভূমিকা তাঁর অভিনয়ে।
হিংসা ক্রোধ ঘৃণার খোলস ছেড়ে
যা যা পার সব শিখে নিলে
তাঁকে পাবে।

১৪৫

শরীর অর্পণ করি— আত্মা, তাও দিই।
বেজেছি ডমরু হয়ে তাঁর।
তাঁকে নিয়ে আমার ডানায় আমি আকাশে উড়াল দিয়ে
স্বর্গ আর নরকের নেপথ্যে কী আছে, জেনেছি তা।

১৪৬

তুমিই চালাও, পঞ্চতন্ত্রের ভেতর দিয়ে
জীবন জপ যে শ্বাসে,
সব সৃষ্টি মিলে যায় অনাহত নাদে।
অনির্ণেয়, তোমায় কে পারে মাপতে?

১৪৭

করেছি গর্জন আমি নদীর উৎসে,
জমিতে দিয়েছি সেচ যেন বান।
তাঁর ক্ষমা, এ-ধরা জেনেছে তাঁকে,
আর তো কিছুর ধ্যান করিনি কখনো।

১৪৮

কখনো শিশির ঝরে, হিমের পতন কখনো-বা।
মধ্যদিনে আঁধার নেমেছে দেখি, দেখি আলোময় দিন।
যে আমি বালিকা, সেই আমি পূর্ণ যুবতী কখনো।
চরৈবেতি কখনো, কখনো জ্বলেপুড়ে খাক।

১৪৯

হে ঈশ্বর, কে-না ক্লান্ত হয় মেরু ঘুরে কিংবা পথে পথে,
কে-না ক্লান্ত বলো জন্মমৃত্যুর অমোঘ চক্রে।
নদী সূর্য চাঁদ— তারা ক্লান্ত নয় প্রবাহে উদয়ে কিংবা অস্তে,
অপরের কুৎসা রটনায় শুধু মানুষ অক্লান্ত।

১৫০

আমি লাল্লা, পথে পথে ঘুরি—
মুখে আঁটা আমার কুলুপ।
কুয়োয়— দেখদারি যারা, তারা পড়ে
আর তারা হয়েছে যখের হাতে খুন।

১৫১

জন্মাইনি কখনো আমি, না জন্ম দিয়েছি কারো।
তেতো শাক কী আদা কিছুই খাইনি।
সত্যবাদীদের আগে আগে চলি,
চলি ছয় শত্রুর পেছনে।

১৫২

এপারে ওপারে তাঁর স্বরূপ তিনিই,
কখনো থাকেন না তো তিনি পিছে।
তিনি দৃশ্য তিনিই অদৃশ্য,
মৃত্যুঞ্জয়ী তিনি।

১৫৩

এপারে ওপারে তাঁর স্বরূপ তিনিই—
ওপারেতে মেলে না এপার।
কণায় কণায় ভাগ হতে হতে তিনি যে অসীম—
হে ঈশ্বর, কী অপূর্ব এই জ্ঞান।

১৫৪

অঙ্গুলিতে জড়িয়েছি কুশ।
নবমীতে কপাট দিয়েছি দোরে,
দশম নিশিতে দীপ জ্বালিয়েছি,
চাঁদ নিয়ে খেলেছি তুমুল একাদশীর রাত্তিরে,
দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় নিজেকে নিজে আমি রোধ করি,
নিজেকে ধুয়েছি তিন নদীর সংগমে ত্রয়োদশী হলে,
চতুর্দশী তিথি এলে চোদ্দো পৃথিবীকে আমি দমন করেছি,
পূর্ণপঞ্চদশী রাতে চাঁদকে উঠতে দেখে
ভেঙেছি নিজের উপবাস
আর শান্ত মনে রয়ে গেছি দূরে ঠেলে যত কামনা বাসনা।
আমার পুতুলপুজো এই, ওগো দেবতা আমার।

১৫৫

পুড়িয়ে কলুষ সব উঠে আসি চুল্লি থেকে।
প্রেমের আগুনে আমি গলে গেছি
যেমন বরফ গলে যায় রোদ পেয়ে।
অন্তরে বাহিরে আর শূন্যতায় শুধু তুমি শিব।

১৫৬

কাঁচা মাংসে লোভ ছিল—
গুরুর অবস্থা যদি এই হয়,
অন্যদের দোষ কী তাহলে?
ব্রহ্মবৃক্ষ কোন মেওয়া এনে দেবে?

১৫৭

অন্যের কড়িতে নেশা করছ কেন মন?
কেন যে বোঝ না সত্য মিথ্যার তফাত?
জন্ম-মৃত্যু আসা-যাওয়া আর
পরের ধর্মের সঙ্গে জুতেছে কেবল স্বল্প জ্ঞানে।

১৫৮

এমন সময় আসছে যখন নরকে সাতপুরুষ পতিত হবে,
অসময়ে ঝড় উঠবে, নামবে বর্ষা,
যখন বামুন আর চাঁড়াল একত্রে বসে
মদ মাংস খাবে।

১৫৯

কখনো নিঃসঙ্গতায় সাড়া দিলে কোথাও রইবে না তুমি।
নিঃসঙ্গতা মহাবিশ্বে আমাকে ফেরাল।
একা থাকা যেন দুটি ব্যক্তির কলহ।
অরূপ আমায় রূপ দান করে চলে গেছে।

১৬০

আমি লাল্লা, আমাকে প্রকাশ্যে ওরা কাঁদতে বলা মাত্র
আমার সন্দেহ সব দূর হল,
সয়েছি মাঘের ঠান্ডা আর আগুনের ওম—
মনের সকল কালো তাতে দূর হয়ে গেল।

১৬১

ওগো দেব, রানি হতে চাইনি।
কী-বা দেবে রাবণ-রাজত্ব! তা তো থাকবে, যা পেলাম।
চলে যাক, চলে যাক আমার নিকট থেকে—
তাতেও আমার কী এমন যাবে?

১৬২

শাস্ত্র পড়ে জেনে তবু ব্রাহ্মণেরা কলুষিত হবে—
ওদের মন্ত্রের উচ্চারণ শুনে শুকোবে নদীর জল।
মত্তনে তবিল চুরি করে আনবে পত্তনের
এমন ডাকাতি করে দেখবে কোনো খেদ নেই।

১৬৩

দেখেশুনে বুঝেছি সবের মধ্যে আমি—
দেখেছি আমার মধ্যে দীপ্যমান সমস্তই—
সব শোনা বোঝা শেষে দেখি শুধু শিব—
ঘর ও দুয়ার সব তাঁর— আমি এমন কে লাল্লা?

১৬৪

মিথ্যা আর শঠতাকে স্বীকার করিনি।
সকলের মধ্যে তাঁকে খোঁজার শিক্ষাই
দিয়েছি আমার মনকে। মানুষে মানুষে খুঁজব বিভেদ কেমনে?
কারো দেয়া খাবার অচ্ছুত হতে পারে কি কখনো?

বর্তমান সংকলনের বাকগুলির ক্রম ও সূত্র প্রসঙ্গ

১ থেকে ১০৯ সংখ্যক বাক

এই বাকগুলি গ্রিয়ারসনের ও লিওনেল ডি বার্নেটের ইংরেজিতে অনূদিত ১০৯-টি বাক নিয়ে ১৯২০ সালে 'Lalla Vakyani or The Wise Saying of Lal Ded, A Mystic Poetess of Ancient Kashmir' মনোগ্রাফটির ক্রমে সাজানো হয়েছে।

[লাল্লার বাক সংগ্রহের চেষ্টা গত আড়াইশো বছরে বিক্ষিপ্তভাবে হয়ে চলেছে, যদিও গ্রিয়ারসন ও ড. লিওনেল বার্নেট প্রথম একটি মান্য সংকলন করার প্রয়াস করেন। গ্রিয়ারসন ও বার্নেটের সংকলনে সংগৃহীত মোট ১০৯-টি বাকের মধ্যে প্রথম ৬০-টির ক্রম রাজানাকা ভাস্করের সংস্কৃতে অনূদিত *লাল্লেশ্বরী বাক্যানি* থেকে নেওয়া, বাদবাকি ৪৯-টি অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

স্যার গ্রিয়ারসন ১৮৯৮-এ স্থাপিত ভারতের linguistic Survey of India-র প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট। গ্রিয়ারসন ও লিওনেল বার্নেটের যৌথ উদ্যোগের ফসল যে-মনোগ্রাফটি, তার মুখবন্ধে যা বলা হয়েছে, তা হল, গ্রিয়ারসন, তাঁর বন্ধুবর পণ্ডিত মুকুন্দরাম শাস্ত্রীকে লাল্লার বাকের সন্ধান করতে বলেন। লাল্লার বাকের বা এই মৌখিক সাহিত্যের কোনো লিখিত পুথি জোগাড়ে ব্যর্থ পণ্ডিত মুকুন্দরাম পৌঁছোলেন আজকের পাক-অধিকৃত

কাশ্মীরের সারদাপিঠের কাছে গুস গ্রামে পণ্ডিত ধর্মদাস দরবেশের কাছে। ধর্মদাস দরবেশ শতাধিক লাল্লার বাক স্মরণ থেকে বলে গেলেন, যা পণ্ডিত মুকুন্দরাম লিখে নিলেন, তারপর হিন্দি ও সংস্কৃতে ভাষ্যসহ তর্জমা করে গ্রিয়ারসনের কাছে পাঠালেন। গ্রিয়ারসন এবার সেগুলো, আরও কিছু জোগাড় হওয়া সারদা হরফে লেখা মূল কাশ্মীরি বাকগুলোর সঙ্গে মেলালেন। প্রসঙ্গত কাশ্মীরি ভাষায় লেখা এই বাকগুলো হাঙ্গেরি বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যার মার্ক অওরেল স্টেইন সংগ্রহ করেছিলেন অক্সফোর্ডের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউটের জন্য। স্যার স্টেইনের সংগৃহীত প্রথম পুথিটার মাত্র পনেরোটা পাতা পাওয়া যায়, সেগুলি সারদা হরফে কাশ্মীরিতে লেখা। এটি মূল্যবান তেতাল্লিশটি বাকের সন্ধান দেয়, যেগুলি সংস্কৃতপণ্ডিত রাজানাকা ভাস্কর সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি আরও মূল্যবান, সেখানে উনপঞ্চাশটি বাক, তৎসহ টীকা ভাষ্য ও উচ্চারণ-পদ্ধতি ও বাকগুলির নির্দিষ্ট ছন্দের উল্লেখ ছিল। গ্রিয়ারসন এই তুলনামূলক অধ্যয়ন ছাড়াও ধর্মপ্রচারক ও কাশ্মীরি লোকগাথার সংগ্রাহক রেভারেন্ড জে হিন্টনে নোয়েলসের *ডিকশনারি অফ কাশ্মীরি প্রোভার্ব অ্যান্ড সেয়িংস* (বম্বে, ১৮৮৫) পড়েন, যেখানে লাল্লার বাক বলে লোকশ্রুতি আছে এমন অনেক বাকের সন্ধান পান। তখনকারমতো প্রাপ্ত ১০৯-টি বাক একত্রে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

গ্রিয়ারসন কাশ্মীরি ভাষা ও সংস্কৃতে অনূদিত (আঠারো-উনিশ শতকের আধুনিক কাশ্মীরি) বাকগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ইংরেজিতে অনূদিত এটাই লাল্লার বাকের প্রথম ছাপা সংস্করণ। গ্রিয়ারসনের উদ্দিষ্ট পাঠকেরা মূলত পশ্চিমি দেশগুলির, তাই গ্রিয়ারসন অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা বাকের অন্তর্গত অর্থকে বিধৃত করেন। তা ছাড়া এইসব বাকের টীকা, ভাষ্য, ছন্দ, যোগ সম্বন্ধিত নিবন্ধ এবং লিওনেল ডি বার্নেটের কাশ্মীরের শৈবতন্ত্রের ওপর লিখিত নিবন্ধ সংযুক্ত করে ‘Lalla Vakyani or the

Wise Saying of Lal Ded, A Mystic Poetess of Ancient Kashmir', এই নামে মনোগ্রাফটি ছাপেন। প্রকাশক রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, লন্ডন। মুদ্রক অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের ফেড্রিক হল। এই প্রসঙ্গে 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি' নভেম্বর ১৯২১ সংখ্যায়, পণ্ডিত আনন্দ কাউল লিখেছেন, "আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে প্রখ্যাত কাশ্মীরি তপস্বী পি ভাস্কর রাজদান (গ্রিয়ারসন ও জয়লাল কাউলের লেখায় রাজানাকা ভাস্কর) ৬০-টি বাক সংগ্রহ করে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন (গ্রিয়ারসন ও বার্নেটের মনোগ্রাফের মুখবন্ধ অংশের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, এই ৬০-টি বাক ছাপা নয়, ম্যানুস্ক্রিপ্ট হিসেবেই ছিল), যা রাজ্যের রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। সন্ত লক্ষ্মণ কাক, যিনি বছর পঞ্চাশ হল মারা গেছেন, তাঁর সংগ্রহ থেকে ১০৯-টি বাক নিয়ে আরও একটি সংকলন (যার মধ্যে উপরিউক্ত ৬০-টি ভাস্কর রাজদানের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত) করেন। (যদিও এগুলি ছাপা হয়েছিল নাকি ম্যানুস্ক্রিপ্ট, তার বিশদ উল্লেখ নেই আনন্দ কাউলের লেখায়, এ ছাড়া গ্রিয়ারসনদের মনোগ্রাফে এই সংকলনটির উল্লেখ নেই।) তিনি (লক্ষ্মণ কাক) সংস্কৃত গদ্যে বৈদান্তিক পঙ্‌ক্তিগুলোর টীকা লেখেন। এই সংকলনের একটি কপি স্যার গ্রিয়ারসন ও ড. লিওনেল বার্নেট সংগ্রহ করেন (যা গ্রিয়ারসনদের মন্তব্যের সঙ্গে মিলছে না) এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এইটি রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। সৌভাগ্যবশত আমি ২০০-র ওপরে লাল দেদের বাক সংগ্রহ করেছি এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ করব।"

যদিও 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি'তে ১৯২১ থেকে ১৯৩৩ অবধি বিভিন্ন সংখ্যা ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, আনন্দ কাউল ৮৪-৮৫-টি বাক ইংরেজিতে অনুবাদ করে টীকাসহ প্রকাশ করেছেন এবং এটা বলা যায়, যদি ধরেও নিই উনি ২০০-টি বাক সংগ্রহ করেছিলেন ও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন,

তবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই গ্রিয়ারসনদের সংকলনের ১০৯-টি এবং হিন্টন নোয়েলসের *ডিকশনারি অফ কাশ্মীরি প্রোভার্ব অ্যান্ড সেয়িংস*-এর অন্তর্ভুক্ত আরও ৪-টি (যার মধ্যে একটি তথাকথিত বাক নয় বরং কথোপকথন ও ৫-টি গ্রিয়ারসনদের ১০৯-টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) বাক নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, এই দুটি প্রচেষ্টার ব্যাপারে জয়লাল কাউল স্পষ্টত বলেছেন (*লাল দেদ*, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৭৩), মান্য অনুবাদ ১৮৪-টি। যার মধ্যে ১০৯-টি গ্রিয়ারসনদের আর ৮৪-টি আনন্দ কাউলের। আনন্দ কাউলের সংগৃহীত এই ৮৪-টি বাকের মধ্যে ৯-টি বাক আসলে দুটি বাকের সংযুক্তি। অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী ৭৫ ও ৯-টি মিলে ৮৪-টি ধরতে হবে। জয়কাল কাউলের মতে, গ্রিয়ারসনদের ১০৯-টির মধ্যে রাজানাকা ভাস্করের সংস্কৃতে অনূদিত ৬০-টি বাক অন্তর্ভুক্ত। ওপরের দু-পক্ষের বক্তব্য ও প্রফেসর জয়লাল কাউলের গবেষণা মিলিয়ে বলা যায়, গ্রিয়ারসনেরা যে ১০৯-টি বাক অনুবাদ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রথম পুথির ৪৩-টি ছাড়াও দ্বিতীয় পুথিটির অন্তত ১৭-টি বাক রাজনাকা ভাস্করের সংস্কৃত অনুবাদ।

গ্রিয়ারসন ও বার্নেটের ১০৯-টি বাকের (৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০) মধ্যে হিন্টন নোয়েলসের করা ৫-টি পুনরায় অনুসৃজন করা হয়েছে। জয়লাল কাউলের মতে, গ্রিয়ারসনদের অনুবাদের ৯৯ ও ১০০ নম্বর বাকদুটি আজিজ খান সৃজিত।

গ্রিয়ারসনদের ১০৯-টি বাকের মধ্যে ১২-টি বাক (৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩) জয়লাল কাউল তাঁর বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কাশ্মীরি ভাষাতত্ত্ব ও প্রাচীন কাশ্মীরি কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দের বিচার করে এই বাকগুলোকে আদৌ লাল্লার বলা যায় কি না, এই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে জয়লাল কাউল তাঁর সংকলনে বাদ দিলেও, উত্তর ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব নিয়ে মহাগ্রন্থের লেখক গ্রিয়ারসনের বইটির

ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এই সংকলনে গ্রিয়ারসন ও বার্নেটের ১০৯-টির সব ক-টিই উক্ত মনোগ্রাফের ব্যবহারক্রমেই রাখা হয়েছে।]

১১০ থেকে ১১২ সংখ্যক বাক

রেভারেন্ড হিন্টন নোয়েলসের *ডিকশনারি অফ কাশ্মীরি প্রোভার্ব অ্যান্ড সেয়িংস* থেকে এই তিনটি বাক নেওয়া হয়েছে।

[এই তিনটি বাকও জয়লাল কাউল তাঁর বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেননি, পূর্বোক্ত ভাষাতত্ত্ব ও ছন্দ নিয়ে সংশয়ের কারণে। রেভারেন্ড নোয়েলস-কৃত এই তিনটি বাক এই সংকলনে রাখা হয়েছে। কারণ, এগুলি হিন্টনের গ্রন্থভুক্ত এবং যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। গ্রিয়ারসনেরা তাঁদের ১০৯-টির মধ্যে এই ৩-টিকে স্থান না দিলেও মনোগ্রাফটির ‘পরিশিষ্ট ১’-এ এগুলি রাখা হয়েছে।

উপরিউক্ত সব ক-টি (১০৯-টি ও ৩-টি অর্থাৎ ১১২-টি) বাকই সাম্প্রতিক কালে পেঙ্গুইন থেকে প্রকাশিত *আই, লাল্লা: দ্য পোয়েমস অফ লাল দেদ* (২০১৫) গ্রন্থে লাল্লাকে নিয়ে দীর্ঘ বছর ব্যাপী গবেষণায় নিয়োজি কবি রঞ্জিত হসকোটে ইংরেজিতে অনুসৃজন করেছেন।

প্রসঙ্গত বলা যায়, স্যার রিচার্ড কারনাক টেম্পল (*The Word of Lalla the Profetess*, Cambridge University Press, 1924) গ্রিয়ারসনদের ও স্টেইনের গ্রন্থপাঠে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যে-গ্রন্থটি লেখেন, তাতে গ্রিয়ারসনদের ১০৯-টি ছাড়াও নোয়েলসের ১০-টি এবং স্টেইনের যে ৪৯-টি গ্রিয়ারসনদের অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত, তার থেকে ৪৭-টির অনুসৃজন করেন। তবে টেম্পলের গ্রন্থটি মূলত গদ্যের। এখানে লাল্লার বাকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার বিশ্লেষণের পাশাপাশি তুলনামূলক, বিশেষত এই উপমহাদেশীয় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। টেম্পল কোনো

নতুন বাকের সন্ধান দেননি। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর সাপেক্ষে শেষতম অধ্যায়ে যে-বাকগুলির অনুসৃজন করেছেন, সেগুলির ক্রম পূর্বোক্ত সংকলনগুলির ক্রমে না সাজিয়ে তত্ত্বনির্ভর বিশ্লেষণ ও টীকাসহ ৪৬-টি পর্বে সাজিয়েছেন। এই মর্মে একটি নির্ঘণ্টও যুক্ত করেছেন।]

১১৩ থেকে ১৪৬ সংখ্যক বাক

এই ৩৪-টি বাক জয়লাল কাউলের সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত *লাল দেদ* (ইংরেজি) গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

[এই ৩৪-টি বাক আনন্দ কাউল-কৃত ইংরেজিতে লেখা *লাল্লা যোগীশ্বরী* থেকে জয়লাল কাউল পুনরায় ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এবং এই মর্মে একটি নির্ঘণ্ট দিয়েছেন।

এর বাইরেও জয়লাল কাউল আরও একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন—*ওয়াকহ্ লাল্লা ঈশ্বরী*, এ কে ওয়াঞ্চু এবং এস এন চারেগি। গ্রিয়ারসন ও আনন্দ কাউলদের পাশাপাশি এই গ্রন্থের ৯৮-টি বাকের রেফারেন্স দিয়েছেন তাঁর পরিশিষ্টের নির্ঘণ্টে।]

১৪৭ থেকে ১৬৪ সংখ্যক বাক

আনন্দ কাউল ‘ইন্ডিয়ান অ্যান্টকুয়ারি’তে বিভিন্ন সময়ে (১৯২১ থেকে ১৯৩২-এর মধ্যে) কিছু নিবন্ধ লিখেছিলেন। এই ১৮-টি বাক সেই সমস্ত নিবন্ধে সন্নিবেশিত বাকগুলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

[আনন্দ কাউল গত শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকে লাল্লাকে নিয়ে লেখা কয়েকটি নিবন্ধে এই বাকগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করলেও গ্রিয়ারসন বা জয়লাল কাউল কেউই তাঁদের বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেননি। গ্রিয়ারসন ও আনন্দ কাউল সমসাময়িক কালে গবেষণা ও বাকগুলির অনুসন্ধান করেছিলেন। সম্ভবত এই বাকগুলির সন্ধান গ্রিয়ারসন পাননি। এ ছাড়া আনন্দ কাউল নিজে কাশ্মীরি হওয়ায় এবং গ্রিয়ারসনের মনোগ্রাফটি প্রকাশের পর প্রায় আরও এক দশক অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ায়, তাঁর পক্ষে অতিরিক্ত কিছু বাক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু গ্রিয়ারসনের সংগৃহীত ১০৯-টির পর আনন্দ কাউল আরও যে ৮৪-টি বাক সংগ্রহ করেছিলেন, তার থেকে এই বাকগুলিকে জয়লাল কাউল সংশয়াতীতভাবে লাল্লার বাক হিসেবে মেনে নিতে চাননি বলে তাঁর বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেননি। রঞ্জিত হসকোটে ইংরেজিতে যে ১৪৬-টি বাক অনুসৃজন করেছেন, সেই সংকলনেও এই বাকগুলি নেই, তথাপি আমরা এগুলি রেখেছি লাল্লার বাক হিসেবে মেনে নিয়ে। এখন অবধি কারো পক্ষেই নির্দিষ্ট করে কোন বাকগুলি লাল্লা সৃজিত, তা শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা সম্ভব হয়নি। আনন্দ কাউল প্রাচীন কাশ্মীরি ভাষা, সংস্কৃত ও ইংরেজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্থানীয় কোনো ক্ষুদ্র পত্রিকায় নয়, বরং 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি'র মতো বিখ্যাত জার্নালে সেগুলো প্রকাশ করেছিলেন। এ ছাড়া লাল্লার বিষয়ে প্রচলিত নানা লোকশ্রুতি নিয়ে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন। পরবর্তীকালে সকল গবেষকই লাল্লা বিষয়ক গ্রন্থগুলোয় এইসব লোকশ্রুতি হয় ব্যবহার করেছেন, নয়তো সেইসব লোকশ্রুতির সাপেক্ষে লাল্লার জীবন ও সাধনাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। আনন্দ কাউল সতেরো ও আঠারো শতকের সংস্কৃত অনুবাদগুলির সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ জানতেন। এ ছাড়া আঠারো-উনিশ শতকে যে-ধরনের কাশ্মীরি ভাষা ব্যবহৃত হত, সেই ভাষাতেই প্রাপ্ত মূল কাশ্মীরি থেকে ইংরেজি

অনুবাদ করেছিলেন। এর বাইরে আনন্দ কাউল আঠারো শতকের বিখ্যাত কাশ্মীরি ঐতিহাসিক হাসান ও তাঁর কাজ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। লাল্লার পাশাপাশি রূপা ভবানী ও নুর ঋষির জীবন ও কাব্য নিয়ে আলোচনা ও তাঁদের বাকের অনুবাদ করেছেন 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি'তে। এমন মান্য পণ্ডিতের প্রতি কিছুটা পক্ষপাত রয়েই গেল। কেউ যদি সম্পূর্ণ নিশ্চিত করে প্রমাণ করতে পারেন যে, বাকগুলো আদৌ লাল দেদের নয়, তবুও এই অনুবাদগুলোর কালের সাপেক্ষে একটা গুরুত্ব থেকেই যাবে বলে বিশ্বাস করি। আদপে এই বাকগুলোর মেজাজ লাল্লার অন্যান্য বাকের মেজাজ ও অন্তর্গত স্রোতের খুব দূরবর্তী লাগেনি বলেই এগুলির ঐতিহাসিক ও বৌদ্ধিক গুরুত্ব বিবেচনায় এদের বর্তমান সংকলনে রাখা হল।]

গ্র ন্থ সূ ত্র

ক্রম-নির্ধারণ অংশে উল্লেখিত সূত্রগুলো ছাড়াও অনুবাদ করতে গিয়ে এবং গদ্যাংশ লিখবার কারণে আরও কিছু গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি, যেমন হাওয়াই ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও গবেষক জয়শ্রী কাক ওডিনের *To the other Shore: Lalla's Life and Poetry* (১৯৯৯) ও *Mystical verses of Lalla, A journey of Self-Realisation* (২০০৭), নীলকান্ত কটরুর *Lal Ded: Her Life and Saying* (উৎপল পাবলিকেশন, কাশ্মীর, ১৯৭৯), জয়লাল কাউলের ইংরেজিতে লেখা *Lal Ded*-এর হিন্দি অনুবাদ— অনুবাদক শিবেন কৃষ্ণ রায়না (সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮০), *Lal Ded: The Great Kashmiri Poetess*, সম্পাদক ড. এস এস তক্ষ্যাণী উল্লেখ্য।
